Website: https://www.parthasarathipatrika.com

৪১তম অন্তর্জাল সংখ্যা

৬ই ভাদ্র, ১৪৩০/ 24.08.2023

সম্পাদক

সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

-: সূচীপত্র :-

প্রীতি-কণা	শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ
স্মৃতিচারণ	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
যোগে প্রতিষ্ঠা	শ্রীঅরবিন্দ
মহাশক্তি মহামায়া	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
কবি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনা	শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ
দ্যুতি, মহাদ্যুতি	ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
অরণ্য প্রশস্তি	ঐরম্মদ দেবমুনি ঋষি
কালের নিক্তিতে	শ্রী সুনন্দন ঘোষ

DO NOT COPY

PARTHASARATHI: RNI 5158/ 60 for print format: converted to e-magazine by Publisher: Sunandan Ghosh during prolonged Nationwide Lockdown in 2020.

Website: https://www.parthasarathipatrika.com

Contact: 182 Jessore Road, Flat- D1, Kolkata- 700074. WhatsApp: 9433284720

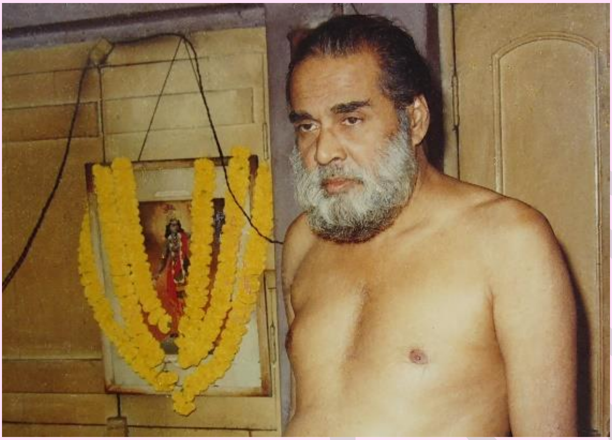

(১০ই মার্চ, ১৯২৬ – ২৪শে নভেম্বর, ১৯৮৬)

প্রীতি কণা

“ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, কাপট্য, প্রতিহিংসাপরায়ণতা প্রভৃতি যে সব আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি তোমার মধ্যে রয়েছে কালক্রমে সেগুলিই তোমার ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। ঐ প্রবৃত্তিগুলির দায় সবসময় প্রত্যক্ষভাবে তোমার উপর না বর্তালেও তাদের প্রভাব তোমার স্নেহ-ভালোবাসার পাত্রকে স্পর্শ করে এবং তাদের পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।”

DO NOT COPY

স্মৃতিচারণ **শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ**

প্রথমেই সকলকে বিজয়ার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। আমি আবার পিছিয়ে পড়েছি। গত আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আমি বাড়ি ছাড়া। মাঝে মীরার সাথে (ডঃ মীরা আগরওয়াল) আগরতলা গিয়েছিলাম। আগরতলা যাব কোনও দিনও ভাবিনি। কিন্তু মীরার ত্রিপুরাতে পরীক্ষা নিতে যাবার দৌলতে আমারও আগরতলা দেখা হয়ে গেল। ফিরে এসেই কয়েকদিন পরেই মুক্তিনাথ (নেপাল) যাত্রা করলাম। দীর্ঘ চার বছরের ব্যবধানে আমার ওজন মোটামুটি আর ভদ্রমহিলার মত নেই। তাই এবার প্রচণ্ড কষ্ট হয়েছে। একে বয়স বেড়েছে, তার উপর হৃৎযন্ত্রের বৈকল্য। মুখে কিছু বলি আর না বলি একটু পরিশ্রম হলে, রাগ হলে বা দুঃখ পেলে কোথাও একটা কষ্ট হয়। বলতে আবার অহং-এ লাগে, তাই চুপ করে সহ্য করবার চেষ্টা করি।

শ্রীমান সুনন্দন আমার পুত্র হলেও Trekking বা Expedition-এর Leader হিসাবে অতুলনীয়। যেমন তার ধৈর্য্য তেমনি সে পরিশ্রমী। তার সঙ্গে বাইরে না বেরোলে তার চরিত্রের এ দিকটা বোঝা যায় না। বাড়ীতে সে দু ঘন্টা ধরে স্নান করে, তিন ঘন্টা ধরে পূজা করে, চার ঘন্টা ধরে খাওয়া সারে। আজকাল তার আরেকটা গুণ বেড়েছে। সে খুব ভালো রান্না করতে শিখেছে। এখন আমি বাইরে গেলে তার খুব আনন্দ হয়। সে নিজে রান্না করবে। ৺কালীপূজার দিন রাত্রে খেয়ে কিশোর খুব তারিফ করল। বলে উঠলো, “মামা বলেছিলেন ভালো সাধু হলে ভালো রান্না করতে পারা চাই।” কথাটা মিলিয়ে দেখলাম - সত্যি। শ্রীপ্রীতিকুমার দারুণ ভালো রান্না করতেন। আমরা মাংস রান্না করলে সব মশলা একটি পাত্রে মাংসের সাথে মিশিয়ে দিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিই। শ্রীপ্রীতিকুমার মাংস উনুনে চাপাবার আগে অন্তত আধঘন্টা ধরে কাঁচা মাংস তেল মশলা দিয়ে মেখে নিতেন। মনে হত দই কলা সহযোগে চিঁড়ে মাখছেন। সরষে বাটা দিয়ে ইলিশ মাছ ভাপা যেভাবে করতেন, তার তুলনা নেই। অমন রান্না আমি আজও কারও হাতে খাইনি।

Do Not Copy

শুক্তো করবার সময় কি মচমচে করে বড়িগুলি ভেজে নিতেন। পারশে মাছ ট্যাংরা মাছ বেগুন দিয়ে রান্না করলে নিজেই কালজিরে বেটে নিতেন। ওটা বোধহয় যশোর খুলনার Special রান্না। আমাকে হাতে করে শিখিয়েছেন। কিন্তু আমার মনে পড়েনা কোনও দিন আমাকে বলেছেন, “আজ তুমি ভীষণ ভালো রান্না করেছ।” হয় লবণ কম হত, নয় ঝাল কম হত, নয় কোনও না কোনও খুঁত থাকত। আমার এজন্য ভীষণ দুঃখ থাকত। মুখে বলতাম, “যা করেছি, বেশ করেছি।। ঐরকম রান্নাই খেতে হবে।” এখনও তাঁর সামনে যখন নিত্য খাবার ধরে দিই, মুখের দিকে তাকাই। নিজে নিজেই জিজ্ঞেস করি, “ঐ বাজে রান্নাগুলি খেতে হচ্ছে তো?” এখনও সবকিছু না দিলে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় আমার কোনও ত্রুটি হয়ে গেছে। যেদিন অনেকটা চা কমে যায়, সেদিন খুব ভালো লাগে।

মুক্তিনাথ ট্রেকিং বেশ কষ্টকর। কতো জায়গাতে নদী পেরোতে হয় তার ঠিক নেই। কোথাও জুতো খুলতে হয়, কোথাও জলের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয়। শেষের গ্রাম ঝাড়কোট-এর পর বেশ খাড়া চড়াই। সারা রাস্তা আমার মেজাজ খুব খারাপ ছিল। ঐ ভাদ্রমাসের পূর্ণিমায় ওখানে মেলা বসে। দূর দূরান্ত থেকে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে ওখানকার বাসিন্দারা (নেপালী, থাকালী, তিব্বতী) মুক্তিনাথে পূজা দিতে আসেন। আমার মত আশী কেজি ওজনের কোনও পুরুষ বা মহিলাকে আমি দেখিনি। দলে দলে লোক আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আর বলে উঠছে, “মোটু ছে”। কোথাও বাচ্চারা আমাকে ঘিরে ধরে হাততালি দিতে শুরু করেছে। শেষের দিকে প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার থাকতে আমার মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। রাগ প্রকাশ করতে পারছি না। ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছি। লোকগুলোকে যদি দু’চার ঘা দিতে পারতাম তাহলে অত দুর্বল বোধ করতাম না। এদিকে খিংগা গ্রামের আগে থেকে রেখা ও সন্দীপ দ্রুততালে হেঁটে উধাও হয়ে গেছে। বাপীকে বললাম, “আমি আর হাঁটবো না। আমার ঘোড়া চাই।” “জোমসোম” থেকে ঘোড়া না নিলে নাকি ঘোড়া পাওয়া যায় না। এদিকে সোমা বেচারী আমার সাথে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। আমার ইচ্ছে ছিল খিংগা গ্রামে থেকে যাব। কিন্তু দলের অপর দুজন শ্রীমতী

DoNotCopy

রেখা ও সন্দীপের কোনও হদিশ না থাকায় আমাদের আগে যেতেই হবে। খিংগার আগে থেকে আমার অবস্থা কাহিল। শ্রীমান সুনন্দন বলেই ফেললো, "তুমি রোগা না হলে আর তোমাকে নিয়ে আসব না।" মেজাজ খারাপ হয়েই গেছিল, নিজের ছেলের থেকে পরের ছেলে ভালো। সব কথা শোনে, তাই তাকেই ডাকতে লাগলাম একটি ঘোড়ার জন্য। সামনে দিয়ে সওয়ারী নিয়ে কত ঘোড়া চলে যাচ্ছে। আমার কপালে নেই। খিংগা গ্রামে প্রায় শুয়ে পড়লাম। জুতো খুলে ফেলতে হল। Ruck sack মাটিতে ফেলে আর এগোব না ঠিক করলাম। সুনন্দনকে বললাম এগিয়ে যেতে। পরদিন আমি ও সোমা যাব। দৈব আর কাকে বলে? যেখানে শুয়ে পড়েছিলাম, সেখানেই একটি ঘোড়া এসে দাঁড়াল। দর করতেই চাইল দুশো টাকা, সহিসের জন্য একশো, মোট তিনশো টাকা। তাই সই। আমি চড়ে বসলাম। নিজেকে তখন পাখীর মত হালকা লাগছিল। মনে হল আমি ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই হয়ে গেছি। কিন্তু সেই ঘোড়া মাঝ রাস্তায় থেমে যাওয়াতে সহিস জিজ্ঞেস করল, "মাইজী, আপকী ওজন কিতনা হ্যায়?" তোতলাতে উত্তর দিলাম, "আট্ষট্ কেজি।" মনে মনে জানি আসবার আগে দেখে এসেছি ৭৮ কেজি। যাইহোক, রাত্রি হবার আগেই মুক্তিনাথ পৌঁছেছিলাম এবং রেখা ও সন্দীপকে মাঝ রাস্তায় বসে থাকতে দেখেছিলাম। সেসব বিবরণ পরে লিখব।

মহালয়ার দিন কলকাতা ফিরলাম। এসে সকলকে ফোন করে জানলাম শ্রীমতী হৈমবতী দেবী (প্রমীলা পাল) খুব চিন্তিতা তাঁর মেয়ের জন্য। মহালয়ার দিন এই "শ্রীমতী" মর্তে আবির্ভূতা হয়েছিলেন, তাই সেদিন সকলেই এ বাড়িতে আসেন বেশ কয়েক বছর ধরে। গীতাদিকে ফোন করেছিলাম আসবার খবর দিয়ে। গীতাদি বললো, "মাসীমার সাথে একটু কথা বল।" আমাকে মাসীমা বলে উঠলেন, "তুমি তো নিজের ছেলেটিকে ট্যাঁকে করে নিয়ে গেছ, আমার মেয়েটির জন্য আমি চিন্তা করছি।" তিনটি তীর্থস্থান (মুক্তিনাথ, পশুপতিনাথ ও দক্ষিণাকালী) দর্শন করে কলকাতায় পোঁছাতেই প্রথম ধাক্কা খেলাম। শ্রীপ্রীতিকুমারকে বললাম, "শরীর ত্যাগ করে গেছ, বড় ভালো কাজ করেছ। না হলে এইসব কথা শুনে তোমাকে জবাব

Do Not Copy

দিতে হতো। নিজে তো পালিয়ে বেঁচেছ, আমার জন্য এমন সব সঙ্গী রেখে গেছ কেন? আমি তো খুব সাধারণ, সহ্য শক্তি কম। আমাকে মূক-বধির করে রাখতে পারনি?" কথাটা উল্লেখ করলাম এইজন্য শ্রীপ্রীতিকুমার আমাদের কখনও আমার তোমার শব্দ ব্যবহার করতে শেখান নি। "আমার" শব্দটির প্রতি তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। আমি এখনও আমার ঘর, আমার বাড়ী বলি না। বাপীর ঘর, শ্রীপ্রীতিকুমারের ঘর, যে ঘরে আমি থাকি আমি বলি "ছোট ঘর"। গত ৩৪ বছর ধরে আমি আমাদের বাড়ী, আমাদের সংসার ইত্যাদি বলে এসেছি। যাইহোক, একথাটা লেখা কাউকে কষ্ট দেবার জন্য নয়। নিতান্ত বক্তব্যচ্ছলে লেখা। পাঠক পাঠিকা বুঝতে পারবেন কোন পরিবেশ ও অনুশাসনে আমাদের এত বছর চলতে হয়েছিলো।

আমার লেখাতে আমি সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারিনা। সেদিন আমার এক আত্মীয়া বলেই ফেললেন খুব রেগে, "কেন সব কথা লেখ? কতো শিক্ষিত লোকেরা পড়েন!" বুঝলাম কোথাও লেগেছে ভাই বা বোনের ব্যাপারে। কিন্তু আমার সমাজটা যে অশিক্ষিত লোকের নয় সেটা তাকে বলতে পারলাম না। শ্রীপ্রীতিকুমার মাঝে হঠাৎ বলে উঠতেন মজা করে, "পরিহাস নির্মম, কিন্তু সত্য।" – আমার জীবনে বিধাতা পুরুষের পরিহাস তো অতি সত্য। যে পারে সেই একটু জ্ঞান দিয়ে দেয়। আমি ও বাপী মূর্খের মতো মুখ করে তাকিয়ে থাকি।

বর্তমানে কেউ আমাদের বাড়ীর পথ ত্যাগ করেছেন। তবু বন্ধুর সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। এবং তাঁরা প্রত্যেকে উপকারী বন্ধু। যিনি আসতে পারেন না, তিনি চিঠি লিখে খোঁজ খবর নেন। এর মধ্যে আবার আমি নীরেনদা, শ্রীসুখদাচরণ মজুমদার, কিশোর, ডঃ পি সি মুখার্জী, অধ্যাপিকা স্মিতা চৌধুরী, রেখা শিকদার, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী, স্বামী বিবিদিষানন্দজী ও আরও সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রীপ্রীতিকুমারকে ভালোবেসে, শ্রদ্ধায় পার্থসারথি প্রকাশ করবার সহায়তা করছেন বলে। রেখা সুদূর জার্মানীতে থেকেও আমাদের প্রতিটি ভালো কাজের সহায়তা করে। প্রতি বছরে সে এদেশে আসে। এবার একটি বছর বাদ পড়েছিল। আমি দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছিলাম, সে কত গভীর সাধনার জগতে প্রবেশ করেছে

দেখবার জন্য। রেখা এলো দু'বছর পর। একদিন ছেড়ে পরদিন আমাদের সাথে মুক্তিনাথ গেলো। প্রায় আঠেরো দিন একসাথে পথ চললাম। বয়স বাড়ছে, গাম্ভীর্য আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আঠেরো দিনের পথ চলায় সে গাম্ভীর্য কোথায় উড়ে গেলো! দেখলাম ভদ্রমহিলা একটি জিনিষ রপ্ত করেছেন – "বাতিক", -- সোজা বাংলায় আমরা যাকে বলি "শুচীবাই।" শব্দটা ঠিক হল কি? সাধনার কথা বলতে পারব না। নিজেকে ঠিকঠাক রাখা তো সাধনার মধ্যেই পড়ে। সে সাধনা আমার দ্বারা না হলেও একটা দিকে আমাকে কেউ ছুঁতে পারবে না সেটা হল শ্রীপ্রীতিকুমার আমার কোনও ইচ্ছেই অপূর্ণ রাখছেন না, সেই আশীর্বাদ আমি নিজের জীবনেই উপলব্ধি করতে পারছি। হয়তো এ ব্যাপারে আমার প্রাপ্তি সকলের চেয়েই বেশী .... ।

(** রচনাকাল - অক্টোবর, ১৯৯০)

(নেপালের মুক্তিনাথ মন্দিরের সামনে পর্বতপ্রাণার পতাকা সহ)

DO NOT COPY

(মুক্তিনাথের পথে নীলগিরি শিখর)

(টুকুচে গ্রাম থেকে মাউন্ট টুকুচে)

DO NOT COPY

(ঘোড়াপানি পাস থেকে মাউন্ট ধৌলাগিরি)

(জোমসোম থেকে মুক্তিনাথের পথে কালী গণ্ডকী নদী)

DO NOT COPY

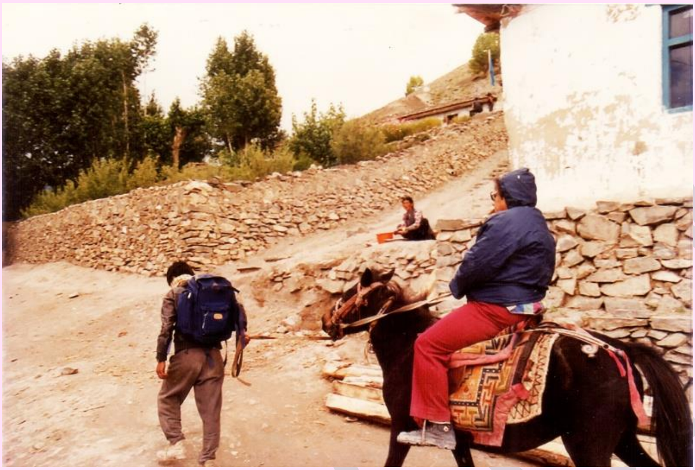

(খিংগা গ্রামে অশ্বারোহিনী শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ)

(কুয়াশামাখা পথে কোথাও চড়াই কোথাও উৎরাই)

DO NOT COPY

(ধ্বসপ্রবণ এলাকায় অস্থায়ী পথ দিয়ে)

(রেখা শিকদার, সন্দীপ চৌধুরী, সুনন্দন, মেজর শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ, সোমা)

(সেপ্টেম্বর, ১৯৯০-এ নেপালের মুক্তিনাথ মন্দিরের পথে ট্রেকিং-এর নির্বাচিত ছবি। প্রিন্ট থেকে ডিজিটাইজ করা)

DO NOT COPY

চঞ্চল মনে যোগ সাধনার ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়। প্রথমে প্রয়োজন মনের স্থিরতা। ব্যক্তিগত চেতনাকে ডুবিয়ে দেওয়া এ যোগের প্রথম লক্ষ্য নয়, প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে মনকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক চেতনার দিকে খুলে ধরা। এ জন্যও প্রথম প্রয়োজন মনের স্থিরতা।

মনের মধ্যে স্থির শান্তি ও নীরবতা প্রতিষ্ঠা করা সাধনায় প্রথম প্রয়োজন, নতুবা তুমি অভিজ্ঞতা পেতে পার কিন্তু কিছুই স্থায়ী হবে না। শান্ত মনের মধ্যেই সত্য চেতনা তৈরি করা যায়। শান্ত মনের অর্থ এ নয় যে সেখানে কোন চিন্তা বা মনের কোন কাজ থাকবে না। এ সব থাকবে বাইরে। তুমি তোমার সত্য সত্তাকে অনুভব করবে ভিতরে এসব থেকে আলাদা ভাবে। এদের তুমি লক্ষ্য করবে কিন্তু এদের দ্বারা পরিচালিত হবে না। সতর্কতার সহিত এদের বিচার করতে সক্ষম হবে। যা পরিত্যাগের সমস্তই পরিত্যাগ করবে। সকল সত্য চেতনা ও সত্য অভিজ্ঞতা গ্রহণ করবে ও রাখবে।

মনের নিষ্ক্রিয়তা ভাল কিন্তু মনকে নিষ্ক্রিয় করতে চেষ্টা করবে শুধু সত্য এবং ভগবৎ শক্তির স্পর্শের কাছে। যদি তুমি নিম্ন প্রকৃতির প্রস্তাব এবং প্রভাবের কাছে মনকে নিষ্ক্রিয় হতে দাও তাহলে উন্নতি করতে পারবে না, অধিকন্তু তুমি নিজেকে উন্মুক্ত করবে বিরুদ্ধ শক্তির কাছে যা যোগের সত্য পথ থেকে তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবে।

মায়ের কাছে অভীপ্সা করো মনের স্থায়ী স্থিরতা ও প্রশান্ত ভাবের জন্য – অভীপ্সা করো তোমার ভিতর আন্তর সত্তাকে অনবরত অনুভবের জন্য – বাহির প্রকৃতির দিকে পিছন ফিরে আলো ও সত্যের দিকে মুখ ফিরাবার জন্য।

নিম্ন মন প্রাণ ও জড় জগতের শক্তি হচ্ছে সাধন পথের অন্তরায়। তাদের পিছনে রয়েছে মন প্রাণ ও জগতের বিরুদ্ধ শক্তি। এ সবের মীমাংসা করা যায় ভগবৎ আকাঙ্খায় হৃদয় ও মন একীভূত এবং কেন্দ্রীভূত হওয়ার পর।

স্থির মন হচ্ছে প্রথম ধাপ। নীরব মন হচ্ছে পরবতী ধাপ কিন্তু স্থিরতা থাকতে হবে সেখানে। আমি বলি স্থির মনের অর্থ ভিতরে একটি মনোময় চেতনা যাহা মনের মধ্যে যে চিন্তাসমূহ আসছে চলাফেরা করছে তা দেখে, কিন্তু নিজে অনুভব করে না যে সে চিন্তা করছে। চিন্তা সমূহের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে না। নিজের বলে গ্রহণও করে না। নীরব দেশের মধ্য দিয়ে যাত্রীরা যেমন একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যায় তেমনি চিন্তাসমূহ, মানসিক ক্রিয়া তাহার মধ্য দিয়ে চলে যায়। স্থির মন তাহা লক্ষ্য করে না, লক্ষ্য করার কোন প্রয়োজনও মনে করে না। যে কোন অবস্থায় সে সক্রিয় হয় না বা স্থিরতা হারায় না। নীরবতা স্থিরতার থেকে অনেক বেশী কার্য্যকরী। তাহা লাভ করা যেতে পারে ভিতরের মন থেকে চিন্তাকে নির্বাসিত করে মনকে নিস্তব্ধ এবং চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ বাহিরে রাখতে পারলে। কিন্তু নীরবতা অতি সহজে প্রতিষ্ঠিত হয় উপর হতে অবতরণের দ্বারা। অনুভব করা যায় উপর থেকে তা নামছে, প্রবেশ করছে, অধিকার করছে, ঘিরে ফেলছে ব্যক্তিগত চেতনাকে যা অবশেষে জোর করে ডুবিয়ে দেয় তাকে এক বিশাল নৈর্ব্যক্তিক নীরবতায়।

নীরবতা সবসময় ভাল, মনের স্থিরতাকে আমি সম্পূর্ণ নীরবতা বলি না। আমি বলি বাধা বিপত্তি গোলমাল মুক্ত মন, অবিচল হাল্কা এবং আনন্দপূর্ণ যা নিজেকে খুলে দেয় দিব্যশক্তির দিকে যার দ্বারা স্বভাবের পরিবর্তন হবে। প্রয়োজনীয় জিনিষ হচ্ছে কষ্টদায়ক চিন্তার উদ্ভাবনের অভ্যাস, মিথ্যা অনুভব, এলোমেলো ধারণা, নিরানন্দ ক্রিয়াকর্ম হতে মুক্ত হওয়া। তারা স্বভাবকে বিব্রত এবং মেঘাচ্ছন্ন করে এবং দিব্য শক্তির কাজে বাধা দেয়। যখন মন স্থির এবং শান্তিতে থাকে দিব্যশক্তি

সহজেই কাজ করতে পারে। তাতে সমস্ত জিনিষ দেখা সম্ভব হয় যা তোমার মধ্যে পরিবর্তন করতে হবে বিচলিত বা অবসাদগ্রস্থ না হয়ে। পরিবর্তন সহজতর হয়।

শূন্য মন এবং শান্ত মনের মধ্যে প্রভেদ হচ্ছে এই – মন যখন শূন্য থাকে কোন চিন্তা থাকে না, কোন প্রত্যয় কোনরকম মানসিক কাজ থাকে না, সংগঠিত কোন ধারণা থাকে না, থাকে কেবলমাত্র জিনিষের মূল অনুভূতি। কিন্তু শান্ত মনে মনোময় সত্তার উপাদান স্থির, এতই স্থির যে কিছুই তাকে ক্ষুব্ধ করতে পারে না। যদি চিন্তা কিংবা কর্ম আসে তা মোটেই মনের মধ্যে ওঠে না, তা বাইরের থেকে এসে মনকে অতিক্রম করে; যেমন এক ঝাঁক পাখী মৃদু মন্দ বাতাসে আকাশে উড়ে যায়, তেমনি তা চলে যায় কোন গোলযোগ সৃষ্টি না করে কোন চিহ্ন না রেখে। এমন কি যদি হাজার প্রতিমূর্তি বা অতি উগ্র ঘটনাসমূহ ইহাকে অতিক্রম করে ইহার শান্ত স্থিরতা অক্ষুণ্ণ থাকে, যেন মনের জমিন হচ্ছে অক্ষুণ্ণ এবং শাশ্বত শান্তির উপাদান। যে মন এ শান্তিলাভ করেছে, সে কাজ আরম্ভ করতে পারে নিবিড়ভাবে, দক্ষতার সহিত, কিন্তু সে রাখবে তার মূল স্থিরতা, সে নিজের থেকে কিছু সৃষ্টি করবে না, উপর থেকে গ্রহণ করবে এবং তাতে মনের রূপ দেবে, তার নিজস্ব কিছু যোগ না দিয়ে, শান্তভাবে, অনাসক্তভাবে, যদিও সত্যের আনন্দের মধ্যে, হৃষ্ট শক্তিতে এবং সত্যের গতির আলোতে । **

** (On Yoga P.P. 613-615)

"অধ্যবসায় সহকারে চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ সম্পন্ন হওয়াই সাধকের মহত্ত্ব।

বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাস বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্ত্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে।"

--- স্বামী প্রণবানন্দ

DO NOT COPY

মহাশক্তি মহামায়া

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বেদশাস্ত্রী

‘সর্বস্বরূপে সর্বেশে সর্বশক্তিসমন্বিতে।
ভয়েভ্যস্ত্রাহি নো দেবি দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে।’- চণ্ডী

বঙ্গদেশ শক্তি-সাধনার মহাপীঠ, মাতৃ-আরাধনার পরম তীর্থ। যুগ যুগান্তর ধরে এই পুণ্য ভূমিতে শক্তি সাধনার মন্দাকিনী ধারা নিরবচ্ছিন্ন গতিতে প্রবাহিত। কালপ্রভাবে ঐ প্রবাহ কখনও প্রবল কখনও বা মন্দীভূত হয়েছে। কিন্তু তা কখনও একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। ঐ বেগ বঙ্গ ভূমিতে চির অপ্রতিহত। শক্তি-সাধনার অখণ্ড প্রাণ প্রবাহই বাঙ্গালীকে প্রচণ্ড ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও অমর করে রেখেছে। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, বামাক্ষেপা, পরমহংস দেব প্রমুখ সাধক-মহাপুরুষগণ মহাশক্তির আরাধনা করেই পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শক্তি পূজা বাঙালীর চিত্তে স্বভাবতঃই এক নিবিড় আবেদন সৃষ্টি করে। শক্তি-সাধনা পুরুষ পরম্পরায় বঙ্গবাসীগণের অস্থিমজ্জাগত, বাংলার ধর্ম সাধনায় তথা অধ্যাত্ম সংস্কৃতিতে মহাশক্তির প্রভাব অপরিসীম ও অপ্রতিহত। জগৎ কারণকে মাতৃরূপে আরাধনা করে বাঙ্গালী চির কৃতার্থ। মহাশক্তিকে স্নেহময়ী জননী রূপে হৃদয়ে অনুধ্যান করে বঙ্গবাসীগণের চিত্ত অপার আনন্দে পরিপূর্ণ। তাই এদেশে মাতৃ পূজা বহুল প্রচারিত ও পরম সমাদৃত। কেবল বাঙ্গালীর ভক্তি স্নেহ প্রবণ প্রকৃতির সঙ্গেই নয়, বাংলার সরস কোমল মৃত্তিকার সঙ্গেও এই পূজার সম্পর্ক একান্তই ঘনিষ্ঠ ও সুমধুর। বাংলার মৃত্তিকা দ্বারা জগন্মাতার অনবদ্য ও বিচিত্র প্রতিমা নির্মিত হয়। মৃন্ময়ী মূর্তিতে দেবী পূজা কেবল বাংলা দেশেই সুপ্রচলিত।

ভারতের জাতীয় মন্ত্রের উদ্‌গাতা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানে আমাদের সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা দেশ মাতৃকা মহাশক্তি জননী রূপেই মূর্তিমতী হয়ে উঠেছেন --

‘ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ ধারিণী
কমলা কমলদল বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং।’

DO NOT COPY

আমাদের দেশের বিভিন্ন সাধক মহাশক্তিকে বিচিত্র ভাবে আরাধনা করেছেন। তাঁকে রামপ্রসাদ মাতা ও কন্যা রূপে এবং শ্রী রামকৃষ্ণ সখী, কর্ত্রী ও মাতৃ রূপে ভজনা করেছেন। বৈষ্ণব সাধনায় যেরূপ শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর – এই পঞ্চ ভাবের সাধন পদ্ধতি প্রচলিত; শাক্ত সাধনায়ও সেইরূপ দাসী ভাব, সখী ভাব, সন্তান ভাব, মাতৃ ভাব, বীর ভাব প্রভৃতি সাধন পন্থা বর্তমান। বীর ভাবের সাধকগণ মহাশক্তিকে জায়া বা প্রকৃতি ভাবে ভজনা করেন। এই সকল ভাবের মধ্যে প্রতিটি ভাবের সাধনাই একান্ত নিবিড় ও পরম আত্মীয়তায় পরিপূর্ণ। উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাবেরই সাধনার চরম লক্ষ্য বা মুখ্য উদ্দেশ্য মহাশক্তির প্রসন্নতা সাধন।

'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।' –চণ্ডী

মহামায়া প্রসন্না হলে বরদাত্রী হন এবং মানবগণকে মোহ-মায়ার কুটিল আবর্ত হতে অকাতরে মুক্তি দান করেন। তিনি 'অঘটন ঘটন পটিয়সী'। তিনি আসুরিক শক্তির প্রতি ভীষণ ক্রুর স্বভাবা হলেও শরণাগত দীনার্তের প্রতি পরমা কল্যাণী। তিনি পরিতুষ্টা হলে ঐহিক ভোগ-ঐশ্বর্য্য এবং পারত্রিক আনন্দ সুখ উভয়ই দেন। তাঁর অদেয় কিছুই নেই। তিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ – চতুবর্গ ফলদাত্রী। তিনি লীলাময়ী ও ইচ্ছাময়ী, তাঁর লীলা খেলা অতি বিচিত্র, দেবগণেরও ধ্যান ধারণার অগম্য। তাঁরই ইচ্ছায় জীব বদ্ধ ও মুক্ত হয়। তিনি একাধারে মহাবিদ্যা ও মহামায়া। বিদ্যাশক্তি রূপে তিনি পরমা মুক্তিদাত্রী, অবিদ্যাশক্তি রূপে ঘোর বন্ধনকারিণী।

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরী।' -চণ্ডী

মহামায়ার মায়া দুরতিক্রম্য। জ্ঞানী ও বিবেকী পুরুষগণও তাঁর দুস্তর মায়া মোহ থেকে অব্যাহতি পান না। তিনি তাঁদের চিত্তকেও বলপূর্বক আকর্ষণ করে মোহ গর্তে ও মায়ার আবর্তে নিক্ষেপ করেন। তখন তাঁরাও হাবুডুবু খান, কোন কূল কিনারা খুঁজে পান না। তাঁর প্রভাব অমোঘ ও অপ্রতিহত। তাঁর প্রভাবে কল্পান্তে প্রলয় কালে জগৎপতি ভগবান বিষ্ণুও বিমোহিত হন। দেবাদিদেব মহাদেব,

প্রজাপতি পিতামহ ব্রহ্মা - এঁরাও নিষ্কৃতি পান না। এঁরাও তাঁর অধীন। তিনি এঁদেরও নিয়ন্ত্রী। পরমহংসদেব প্রায়ই গাইতেন -

‘এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে।।
বিল করে ঘুনী পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে,
তার গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে।
গুটিপোকায় গুটি করে পালালেও পালাতে নারে,
মহামায়ায় বদ্ধ গুটি আপনার নালে আপনি মরে।’

মহামায়ার প্রকৃতি অতি বিচিত্র ও অদ্ভুত। তিনি একাধারে শুভঙ্করী ও ভয়ঙ্করী। তিনি সৌম্য হতেও সৌম্যতরা আবার ভীষণা হতে ভীষণতরা। তিনি চিত্তে মুক্তিপ্রদ অহেতুক কৃপা, আবার তিনিই সমরকালে মৃত্যুপ্রদ নিদারুণ নিষ্ঠুরতা। তাতে কঠোর ও কোমল, মধুর ও রুদ্র - এই সকল বিপরীত ভাবের অনবদ্য প্রকাশ। এই তত্ত্বটি জগন্মাতা কালিকা মূর্তিতে বিশেষ রূপে অভিব্যক্ত। কালিকা দেবীর মধ্যে একাধারে কঠোরতা ও কোমলতার অনবদ্য সম্মিলন লক্ষিত হয়। তিনি ঘোর দ্রংষ্ট্রা করালাস্যা আবার স্মেরাননা সুপ্রসন্না, অসি-মুণ্ডধরা আবার বরাভয়-করা।

মহামায়াই অখিল বিশ্ব প্রপঞ্চের মূলাধার-আদ্যাশক্তি পরমাপ্রকৃতি। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপ তিনিই ধারণ করেছেন। জলে-স্থলে, অনলে অনিলে, অন্তরীক্ষে-ব্যোমে, নীলিমায়-নীহারে, লতায়-গুল্মে, পত্রে-পুষ্পে, অণু-পরমাণুতে – সর্বত্রই ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত তিনি জগন্মূর্তি বিশ্বরূপা হয়েও, সর্বাতীতা নিরাধারা নিরাকারা। তিনি সর্বদেবময়ী, সর্বরূপময়ী, সর্বাশ্রয়া। তিনিই এই জগৎ চরাচর সৃজন পালন ও সংহার করেন। তিনি একাধারে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী।

‘ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবী ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।।
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টি রূপা ত্বং স্থিতি রূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।’ - চণ্ডী

যাঁর কটাক্ষে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয়, যিনি সর্বশক্তিময়ী, অনন্ত মহিমময়ী; সেই মহাশক্তিকে বাঙ্গালীগণ পরমা জননী রূপে আরাধনা করে ধন্য ও কৃতকৃতার্থ। জগচ্ছক্তিকে মাতৃরূপে উপাসনা করার পদ্ধতি বাঙালিগণের মধ্যেই সর্বাধিক প্রচলিত। এটি বাঙালীর সাধনার বৈশিষ্ট্য। মাতা সন্তানের সম্পর্ক যেরূপ নিবিড়, সেইরূপ মধুর ও প্রেমপূর্ণ। মাতার ন্যায় ক্ষমাশীলা, স্নেহময়ী, শান্তিদাত্রী, করুণার্দ্রচিত্তা সংসারে আর কে আছেন? কুপুত্র অনেকেই হয় কিন্তু কুমাতা সচরাচর দেখা যায় না। ‘মা’ শব্দটির মধ্যে এমনই মাধুর্য্য, অভয় ও করুণা উৎসারিত যে এই শব্দটি শ্রবণ বা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধা ও পবিত্রতা শান্তিতে আপ্লুত হয়ে উঠে।

মহামায়ার কন্যা রূপটিও বাঙালীর হৃদয়ে এক অপূর্ব আবেদন ও বাৎসল্য সঞ্চার করে। তাঁর এই রূপটিও বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় এবং হৃদয়ের ধ্যানের প্রতিমা। বাঙালী জগচ্ছক্তিকে বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত করে ঘরের দুলালী রূপে গ্রহণ করেছেন। বঙ্গ জননী গিরিরাণী মেনকার এক অভিন্ন রূপ। জগজ্জননী তার কোলে দুলালী গৌরীরূপে স্নেহ আদর লাভ করেন। বিশেষতঃ আমাদের মায়েদের হৃদয় মহামায়ার কন্যা রূপটিকে হৃদয়ে লালন করে অপার সুখানুভব করে। তাঁরা নিজেদের কন্যা জ্ঞানে তাঁকে আদর স্নেহ দান করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেন। বাংলার সাধনার এও এক বৈশিষ্ট্য।

যাহোক, সেই বিশ্বার্তিহারিণী সর্বমঙ্গলা সর্বার্থসাধিকা জননী সমগ্র বিশ্বের অশান্তি-দহন দূর করুন। তিনি বিশ্বমানবকে মধুর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে নিবদ্ধ করুন। তিনি আমাদের সকলকে সৎ বুদ্ধি ও অভয় দান করুন - তাঁর শ্রীপাদপদ্মে এই নিরন্তর প্রার্থনা।

‘প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।।’ - চণ্ডী

DO NOT COPY

কবি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনা

শ্রী অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

কবিরা সাধারণতঃ অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী হন এবং তাঁরা যা সৃষ্টি করেন তা ঈশ্বর-শক্তির সহায়তায় করেন। কবিতা রচনা করার জন্য যেমন ছন্দ প্রয়োজন হয়, তেমনি প্রয়োজন হয় রসের। কারণ ঈশ্বর নিজে হচ্ছেন রসময়। ঋষিগণ উপলব্ধির দ্বারা বলে গেছেন – "রসো বৈ সঃ"। সুতরাং কবির জীবনে ঈশ্বরের প্রভাব থাকবেই।

অনেকের ধারণা, গুরুলাভ না হলে ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব নয়। এটা অবশ্য আংশিক সত্য। কেননা জীবনের যে কোন পথে যে কোন কাজ করতে হলে একজনের সাহায্য শিক্ষা এবং দর্শনের দরকার হয়। স্কুলে ছেলেদের জাগতিক বৈষয়িক পাঠ শেখানোর জন্য যেমন শিক্ষক বা একাডেমিক গুরুর প্রয়োজন হয় তেমনি প্রয়োজন হয় সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যাত্ম বিদ্যা শেখাবার জন্য একজন গুরু বা পথ প্রদর্শক। এই গুরু হলে সাধারণ বিষয়ী অজ্ঞ অন্ধ ও দুর্বল মানুষের খুব উপকার হয়। আবার এমন সংসারী মানুষ আছেন যিনি নিজের শক্তি ও যোগ্যতার বলে ঈশ্বরকে আরাধনা করে তাঁর সান্নিধ্যলাভ করেছেন। যিনি বলেন গুরু ছাড়া ইষ্টলাভ হয় না, তিনি ঠিক কথা বলেন না। কারণ ঈশ্বর হচ্ছেন কৃপাময় এবং প্রেমময়। তিনি সর্বত্র বিরাজমান। তাঁকে যে যেভাবে এবং যেখানে থেকে ডাকুক না কেন তিনি তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হবেন। আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপুর জীবনে। আবার গীতাতে স্বয়ং ভগবান পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে যেভাবে তাঁকে ডাকুক না কেন সে সেইভাবেই তাঁকে পেয়ে থাকে। সুতরাং ঈশ্বরকে লাভ করতে হলে কোন বাঁধাধরা নির্দিষ্ট পথ নেই। তিনি নিরাকার, সাকার, আবার বহুরূপে বা আকারে আমাদের চারদিকে সদা বিরাজমান। তিনি গুরুর মুখে যেমন আছেন, তেমনি আছেন শাস্ত্রের মধ্যে। ভক্ত, ভাগবত ও ভগবান – এই তিনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উপনিষদে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ নিয়ে জ্ঞান-গর্ভ আলোচনা আছে। সুতরাং উপনিষদ পাঠ করলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বর-আরাধনা এবং

DO NOT COPY

ঈশ্বর-উপাসনা করা হয়। আর নাম ও নামী যখন অভেদ তখন ঈশ্বরকে ডাকা আর উপনিষদ পাঠ করা ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভের সমতুল্যই। তাঁর নাম, তাঁর উপাসনা, তাঁর বিষয়ে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করলে তিনি নিজে এসে পাঠকের মনে-প্রাণে আবির্ভূত হন। এমনকি যিনি শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ বা ঈশ্বরীয় আলোচনা করেন তিনি যেমন মনে-প্রাণে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও সান্নিধ্য উপলব্ধি করে ধন্য হন তেমনি তাঁর শ্রোতারাও তার ভাগীদার হন। কবি রবীন্দ্রনাথের কোন আনুষ্ঠানিক বা লোক দেখানো গুরু ছিলেন না ঠিক কথা কিন্তু তিনি তাঁর পিতার মত ব্রহ্মোপাসক ও উপনিষদ পাঠকের সান্নিধ্যলাভ করে যে ঈশ্বরীয় ভাব জ্ঞান ও দিব্যানুভূতি লাভ করেছিলেন তা আজও জগতের ইতিহাসে সত্যই বিরল। পিতাই হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথের আসল গুরু। তিনি পুত্রকে সকল বিদ্যায় দীক্ষিত করেছেন। ঈশ্বরীয় উপাসনার দ্বারা সর্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ করা যায়। আর এই অধ্যাত্ম বিদ্যা লাভ হলে পার্থিব অন্য সব জাগতিক বিষয়ের বিদ্যা জলভাতের মত সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। তাই আমরা দেখি কবি রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন সর্ববিদ্যার আকর এবং বিশ্বের বিস্ময়কর প্রতিভাশালী এবং জ্ঞানী মানুষ । তিনি এই শক্তির বীজ লাভ করেছিলেন ব্রহ্মবাদী একেশ্বরের পূজারী পিতার কাছ থেকে অতি অল্প বয়সে। পিতা দেবেন্দ্রনাথই তাঁর দীক্ষা এবং শিক্ষাগুরু ছিলেন। পিতাকে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত শোনাতেন এবং পিতার ব্রহ্মোপাসনায় বসতেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে ব্রহ্মের তেজোময় ও কল্যাণময় শক্তির বিকাশ হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কোথায়? আর তা হয়েছিল বলেই তিনি এতবড় শক্তিমান ও জ্ঞানবান মহামানব হতে পেরেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, সংসারে যাকে পাঁচজন লোক গণ্যমান্য বলে শ্রদ্ধা করে তার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তি লীলা করছে বলে জানবি। কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনেও ঈশ্বর জীবন দেবতার ভূমিকা নিয়ে বিচিত্র লীলা করে গেছেন। সেই লীলার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখি হিমালয় পর্বতে পিতা-পুত্রের মিলিত ঈশ্বরোপাসনার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে কবি নিজেই তাঁর 'জীবন স্মৃতি' গ্রন্থে লিখে গেছেন, "যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত

শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি-

‘তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় ভব-অন্ধকারে ----’

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন, - সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।”

(জীবন স্মৃতি – হিমালয় যাত্রা – পৃঃ ৯৪-৯৫; অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সংস্করণ।)

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র লিখেছেন কবি –“সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনান্তে একবাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্র-পাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন।” --- (ঐ – পৃঃ- ১০০-১০১)

অনেকের ধারণা কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম। তিনি একেশ্বর পরম ব্রহ্মের উপাসক। তিনি অদ্বৈতবাদী। তাই তাঁর মনে দ্বৈতবাদীর সত্তা স্থান পেত না। কিন্তু তাদের এই প্রকার ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কারণ গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার প্রথমাংশই সোচ্চারে বলে দিচ্ছে যে কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন দ্বৈতবাদী পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব ধর্মের পরম সত্য সেই ‘তৃণাদপি সুনীচেন’-র মূল সুর ধ্বনিত হচ্ছে কবিরচিত গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতার পঙক্তিগুলিতে-

“আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধূলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে।”

--(গীতাঞ্জলিঃ পৃঃ ১৫-- বৈশাখ, ১৩৬৮ সংস্করণ)

আবার ঐ একই সুর ধ্বনিত হয়েছে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের অন্য এক কবিতায় -

‘চরণ পদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে,
নন্দিত করো, নন্দিত করো,

DO NOT COPY

নন্দিত করো হে।' .... (ঐ – পৃঃ ১৯)

আবার ভক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন -

'এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার –
আমার এই মলিন অহংকার।' ...... (ঐ – পৃঃ ৬২)

গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের প্রায় সব কবিতার মধ্যেই কবি রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদী সত্তা এবং পরম বৈষ্ণবের ভাব প্রকাশিত হয়েছে।

উক্ত কাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে আমরা আরও জানতে পারি যে কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শক্তিরও পূজারী। একটি কবিতায় লিখেছেনঃ

'এসো গো শারদলক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে।' (ঐ – পৃঃ ২৫)

এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কবির আর একটি কবিতার প্রথম কয়েকটি পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করছি -

'জননী, তোমার করুণ চরণ খানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণরূপে।
জননী, তোমার মরণ হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।' ..... (ঐ – পৃঃ ৩০)

অবশ্য একথা ঠিক যে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাঁর বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভক্ত অর্জুনকে এই কথা বলেছেন। যারা অজ্ঞ, সাম্প্রদায়িক মনোভাবের অধিকারী এবং ধর্মান্ধ, তারাই ধর্মের ক্ষেত্রে বৃথা ভেদাভেদ জ্ঞান সৃষ্টি করে নিজেরা কষ্ট পায় এবং সমাজ ও জাতির ক্ষতি করে। কবি রবীন্দ্রনাথের মন ঈশ্বরের ওপর যে কতখানি নির্ভরশীল ছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি স্ত্রীকে লেখা তাঁর একাধিক চিঠিতে। সেগুলিতে মহান আত্মার ও ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট কলকাতা থেকে কবি স্ত্রীকে যে চিঠি লেখেন তার এক জায়গায় লিখেছেন- "কিন্তু বারম্বার পদে পদে এই থেকে নিজেকে

DO NOT COPY

বাঁচাবার চেষ্টা করা চাই – মাঝে মাঝে ব্যর্থ হয়েও হতাশ হলে হবে না – ক্ষণিক সংশয়ের দ্বারা আত্মার শান্তিকে কোন মতেই নষ্ট হতে দিলে চলবে না - কারণ এমন লোকসান আর কিছুই নেই – এ যেন দু পয়সার জন্য লাখ টাকা খোয়ানো। গীতায় আছে – লোকে যাকে উদ্বেলিত করতে পারে না, এবং লোককে যে উদ্বেলিত করেনা – যে হর্ষ, বিষাদ, ভয় এবং ক্রোধ থেকে মুক্ত, সেই আমার প্রিয়।” .... (চিঠিপত্র ১ম খণ্ড – ২৫ বৈশাখ, ১৩৪৯ সংস্করণ, পৃঃ ৪৫-৪৬)

উক্ত গ্রন্থের আর একটি পত্রের শেষাংশে কবি লিখেছেন – “সর্বদা প্রসন্নতা দেখতে হবে, চারিদিকে সকলকে প্রসন্নতা দান করতে হবে – সকলে যাতে সুখী হয় এবং ভাল হয় আমি প্রফুল্ল মুখে এবং অশ্রান্ত চিত্তে সেই চেষ্টা করব – তার পরে বিফল হই তাতে আমার কি? – ভাল চেষ্টার দ্বারাতেই জীবন সার্থক হয় - ফল সম্পূর্ণ ঈশ্বরের হাতে। কেবল কর্তব্য করেই প্রফুল্ল হতে হবে – ফল না পেয়েও প্রফুল্লতা রাখতে হবে – তার একমাত্র উপায় মনকে সর্বপ্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা থেকে সর্বদা মুক্ত করে রাখা।” .... (ঐ – পৃঃ ৫৩)

এমনি আর একটি পত্রের শেষাংশে কবি লিখেছেন - “... অনন্ত নক্ষত্র লোকের দিকে যখন তাকাই এবং এই অনন্ত লোকের নীরব সাক্ষী যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর দিকে মনকে মুখোমুখি স্থাপন করি তখন মাকড়সার জালের মত ক্ষণিক সুখদুঃখের সমস্ত ক্ষুদ্রতা কোথায় ছিন্নভিন্ন হয়ে মিলিয়ে যায় দেখতেও পাওয়া যায় না।” .... (ঐ- পৃঃ ৮০-৮১)

এমনই আরও একটি পত্রের প্রথমাংশে কবি তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন- “... বেঁচে থাকতে গেলেই মৃত্যু কতবার আমাদের দ্বারে এসে কত জায়গায় আঘাত করবে – মৃত্যুর চেয়ে নিশ্চিত ঘটনা তো নেই। শোকের বিপদের মুখে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ বন্ধু জেনে যদি নির্ভর করতে না শেখ তাহলে তোমার শোকের অন্ত নেই।” ---- (ঐ – পৃঃ ৪৯)

এমনই আরও অনেক চিঠিপত্রে কবি ব্যক্ত করেছেন নিজের আধ্যাত্মিক চেতনার বৈশিষ্ট্য। অনেকে কবির একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথম পংক্তি ‘বিপদে

DO NOT COPY

মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা' পড়ে কবিকে ঈশ্বর বিমুখী মানুষ বলে বাহবা জানায় বা কবিকে জ্বলন্ত পৌরুষের দ্যোতক বলে অভিহিত করে। আসলে কবি তো নাস্তিক ছিলেনই না বা ঈশ্বরের সর্বশক্তিকে আড়াল করে নিজের পৌরুষ জাহির করেন নি। বরং তিনি আস্তিক হয়ে এর বিপরীত কাজই করেছেন অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সেই মহাশক্তিমান ব্রহ্মচৈতন্যকে নিজের হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে 'জীবনদেবতা' রূপে প্রতিষ্ঠিত করে তাঁরই একান্ত অনুরাগী ও অনুগত হয়ে সারা জীবনের চলার পথে চলেছেন। তবে তিনি সর্বশক্তিমানের কৃপা ও শক্তির উপর নির্ভরশীল হলেও আত্মবিশ্বাস থেকে নিজেকে কখনো বিযুক্ত করতে চাইতেন না, এই কথাটি যেন আমরা ভুলে না যাই কবির দার্শনিক তথা আধ্যাত্মিক ভাবনার কথা বিচার করতে বসে। তাহলে কিন্তু সত্যের এক বিরাট অপলাপ হবে।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যে পত্র লিখেছেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মনের আধ্যাত্মিক আবেগ।

"এখানে আসবামাত্রই আমার সেই অসহ্য ক্লান্তি ও দুর্বলতা দূর হয়ে গেছে। এমন সুগভীর আরাম আমি অনেকদিন পাইনি। এই জিনিসটি খুঁজতেই আমি দেশদেশান্তরে ঘুরতে চাচ্ছিলুম, কিন্তু এ যে এমন পরিপূর্ণভাবে আমার হাতের কাছেই আছে সে আমি জীবনের ঝঞ্ঝাটে ভুলেই গিয়েছিলুম। কিছুকাল থেকেই মনে হচ্ছিল মৃত্যু আমাকে তার শেষ বাণ মেরেছে এবং সংসার থেকে আমার বিদায়ের সময় এসেছে – কিন্তু তস্য ছায়ামৃতং তস্য মৃত্যুঃ – মৃত্যু যাঁর ছায়া, অমৃতও তাঁরই ছায়া – এতদিনে আবার সেই অমৃতেরই পরিচয় পাচ্ছি। ...... " (চিঠিপত্র – পৃঃ ২১ – দ্বিতীয় খণ্ড – আষাঢ়, ১৩৪৯ সংস্করণ।)

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার লস্ এঞ্জেলস্ থেকে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছেন কবি তার মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পত্রের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি – "বক্তৃতার ঝড়ের মুখে সহর থেকে সহরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার agent দুই পুরুষে এই কাজে নিযুক্ত – সে বলে এতলোককে দিয়ে তারা বক্তৃতা করিয়েছে কিন্তু কখনও

এমন লোকের ভিড় ওরা দেখেনি।” জায়গার অভাবে লোক ফিরে ফিরে যাচ্ছে। আমার বোধ হচ্ছে ঠিক সময়েই বিধাতা আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। ...... আমার পক্ষে এই ঘুরপাক নিতান্তই ক্লেশকর। সমস্ত সহ্য করছি এই মনে করে যে বিধাতার বাণী এদের কাছে বহন করবার আদেশ আমার উপরে আছে। .... (ঐ – পৃঃ ১৪ -১৫)

ঈশ্বরের শক্তি যার মধ্যে নির্ভর করে সে সদাসর্বদা কর্মচঞ্চল থাকে। কথায় আছে না, তাঁর কৃপা ও শক্তি পেলে পঙ্গুও উত্তুঙ্গ গিরি লঙ্ঘন করবার শক্তি পায়। ঈশ্বরের শক্তি কি যোগী কিবা গৃহী সকলের মধ্যে দিয়েই অবাধে লীলা করে চলেছে। তবে তাঁর সে শক্তিকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বরের শক্তিবলে অল্প বয়সে এবং অল্প সময়ে যে অসাধ্য সাধন করে গেলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। সংসারী রবীন্দ্রনাথও ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে যে জীবন ও কর্ম আমাদের কাছে প্রকাশ করে গেলেন তা অতুলনীয় এবং বিশ্বের বিস্ময়।

আবার ১৯১২ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে পুত্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও অফুরন্ত কৃপার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন –

“দিনরাত্রির মধ্যে এক মুহূর্তও যদি তোরা আপনার চেয়ে বড়র কাছে আপনাকে উৎসর্গ না করিস, যদি ঘুরে ফিরে সমস্তক্ষণ কেবল আপনাকেই দেখতে থাকিস, তাহলে ভয়ানক ঠকা ঠকবি – আপনার সমস্ত সম্পদকে তাহলে জীর্ণ করে করে নিঃশেষে ফুরিয়ে ফেলবি – নিজের হৃদয়কে প্রাণকে অন্তরের ভাণ্ডার থেকে প্রতিদিনই ভরে নিতে হবে – তাঁকে বলতেই হবে রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ - নইলে কিছুতে রক্ষা নেই, কিছুতে না।” (ঐ – পৃঃ ২২)

১৩১৮ সালের এক পত্রে পুত্রবধূ প্রতিমাদেবীকে কবি লিখেছেন, “যিনি সকলের বড় তাঁকে তুমি সর্বত্র দেখতে পাও এই আমার একান্ত মনের কামনা। মানবজীবনকে খুব মহৎ করে জান। নিজের সুখস্বার্থসাধন কখনই তার লক্ষ্য নয় এ কথা সমস্ত ভোগসুখের মধ্যে মনে রেখ। সংসারকেই বড় আশ্রয় বলে জেনো না

এবং কঠিন দুঃখ বিপদেও ভক্তির সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে শেখ। প্রতিদিনের সুখ দুঃখে তাঁকে প্রণাম করার অভ্যাস রেখ। প্রত্যহই যদি তাঁর কাছে যাবার পথ সহজ করে না রাখ তাহলে প্রয়োজনের সময়ে সেখানে যেতে পারবে না। প্রভাতে ঘুম থেকে উঠেই যেন তোমার মনে পড়ে যে তিনিই আছেন তোমার চিরজীবনের সহায় সুহৃদ পিতামাতা – তাঁরি কর্ম বলে সংসারের কর্ম করবে।”----- (চিঠিপত্র- ৩য় খণ্ড – পৃঃ ১১ – অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯ সংস্করণ)

এমনই অনেক চিঠিপত্র ও রচনার মাধ্যমে আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনার পরিচয় পেয়ে থাকি।

দ্যুতি, মহাদ্যুতি **ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**

দ্যুতি, মহাদ্যুতি, অনিঃশেষ আলোক,
তামসীনিশার দিশা নেই যেথায়
মহান জীবনসমুদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসাগরগুলি
তাদের অন্তরের গূঢ় ব্যথা ব্যক্ত সেথায়,
বিরাট বিপুল অজ্ঞানের গহ্বরগুলি হয়েছে মুক্ত সমুত্থিত
যা ছিল বিত্তহীন চিত্তহীন রিক্ত, তা হয়েছে জ্যোতির্ময়
ভাস্করতায় প্রজ্বলিত দীপান্বিত।
যে আলোক-সময় সীমাহীন, যে জ্যোতির দীপরেখা ও রূপশিখা
অদ্বিতীয় ও এককের স্বরূপ
আলোক শক্তির দ্যুতিতে জ্যোতিতে সমুজ্বল,
একটির পর একটি বদ্ধ দুয়ার যে অরুদ্ধ করে দিতে পারে অপরূপ,
যে দিব্য আভার প্রতিটি ছটা এসেছে

অনন্তের বক্ষের হীরকখণ্ড হ'তে দুলতে দুলতে,
আমারই হৃদয় কন্দরে আজি তার 'দেদোল দেদোল' গতি
প্রস্ফুটন্ত গোলাপের মত ফুটতে ফুটতে।
আলোকের উল্লাসে আজ আমার সর্ব শরীরে শিরায় তন্ত্রীতে স্নায়ুতে
প্রতিটি আহত অণুতে কণাতে দ্রুত উচ্ছল কম্পন এসেছে দিবসে ও রাত্রে,
সে এক অপূর্ব আনন্দ আস্বাদন ও শিহরণ
যা বহন করে নিয়ে চলেছে এক অনাদি অন্তহীন জীবনের পরশন।
আমি এক মহান আলোক সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসমান
আমার সমকালীন সত্তা তাই চিরকালীনের অভিব্যক্তিত্বে জায়মান।

– –

(শ্রীঅরবিন্দের Collective Poems Vol 5. P 150, Sonnets শতবার্ষিকী সংখ্যা 'Light' নামক কবিতার ভাব অবলম্বনে।)

অরণ্য প্রশস্তি — **ঐরম্মদ দেবমুনি ঋষি**

(ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল ১৪৬ সূক্ত) — (অনুবাদক – শ্রী কালীপদ ভট্টাচার্য)

গহণ গভীর ঘন সুনিস্তব্ধ অই অরণ্যানি!
তোমার প্রত্যন্ত সীমা কতদূরে কিছুই না জানি।
আপন বিস্তৃতি মাঝে আপনারে হারায়েছ যেন
খুঁজে খুঁজে নাহি পাও । পান্থজনে শুধাও না কেন
গ্রামের পথের বার্তা? এ নির্জনে একাকিনী থাকি'
কখনও হৃদয়ে তব সশঙ্কিত ভয় জাগে নাকি
নিতান্ত নিরালা বোধে? শ্বাপদ গর্জন করে যবে,
মনে হয় বৃষগণ ডাকিছে গম্ভীর হাম্বারবে;

DO NOT COPY

চিঁহি চিঁহি শব্দে কেহ করে তার প্রত্যুত্তর দান।
যেন তারা বীণাকার – তারে তারে তুলিয়া সুতান
অব্যক্ত নিক্কণ রবে ঝঙ্কারিয়া নিবিড় ঝঞ্ঝনা
মধুর সুস্নিগ্ধ স্বরে অরণ্যের করিছে বর্ণনা।
কভু মনে হয় সেথা চরিয়া বেড়ায় গাভীগণ,
হর্ম্য বলি’ চিত্তপটে কোথাও বা জাগায় স্বপন, -
মনে হয় দ্বার খুলি’ নিস্তব্ধ নীরব সন্ধ্যাবেলা
ঘর্ঘর চক্রের রবে শত শত শকটের মেলা
বাহিরিছে সেথা হ’তে। ওকি শব্দ জাগে থাকি’ থাকি’!
গোধূলি অতীত হেরি’ গাভীরে করিছে ডাকাডাকি
অরণ্যের মাঝে কেহ! ওকি ধ্বনি, কিসের সন্দেহ!
তবে কি কাটিছে কাষ্ঠ বন মাঝে কাঠুরিয়া কেহ
কঠিন কুঠারাঘাতে! সন্ধ্যাবেলা কভু মনে হয়,
চীৎকারি উঠিল কেহ জীবনের করিয়া সংশয়
আপন কল্পিত ভয়ে, - হেরিয়া নিস্তব্ধ অরণ্যানি
কিন্তু সে করুণাময়ী কভু বধ নাহি করে প্রাণী।
আগন্তুক হিংস্র পশু সেথা আসি’ না করিলে বাস –
বনস্থলী চিরকাল অকৃত্রিম সুখের আবাস
লভিয়া সুস্বাদু ফল। কুসুম সৌরভ রাশি রাশি
বিস্তারি’ মহিমা নিজ অন্তরীক্ষে বেড়াইছে ভাসি’
সুগন্ধী কস্তুরী সম। অন্নাভাব নাহিকো সেথায়
বসবাস নাহি করে গ্রামবাসী কৃষক তথায়;
নাহি কর্ম চঞ্চলতা, নাহি জনকলকোলাহল,
মৃগের জননীরূপা। আমাদের জীবন সম্বল।

DO NOT COPY

কালের নিক্তিতে **সুনন্দন ঘোষ**

আটত্রিশ বছর আগে আর জি কর হাসপাতালে
পাশের বেডে দেখেছি
অবহেলায় মরা বাপের আঙুল থেকে
ছেলেকে সাদা পাতায় টিপছাপ নিতে।
কোভিডের সময় পাড়ার সুনসান রাস্তায়
লোকেদের দেখেছি টোটোয় ঘুরে ঘুরে
কুকুরগুলোকে আদর করে খাওয়াতে।

দিন মজুর বাপের দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর
মায়ের দাঁতচাপা লড়াইতে আইএএস হয়েছে ছেলে।
ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার মেয়ে কলকাতায় ক্যাব চালায়।

ঘরে কোটি টাকার ঝাড়বাতি,
চিকিৎসা প্রথম বিশ্বে,
মহান ব্যক্তি মঞ্চে ওঠে
জনগণের জন্য চোখের জল ফেলতে।
সময় বদলায়, মঞ্চ বদলায়,
কুশীলবের ভূমিকা বদলায় না।

মস্তিষ্ক অবচ্ছিন্ন করলে মন দেখা যায় না,
হৃদযন্ত্রে ছুরি চালালে হৃদয় দেখা যায় না।
হৃদয়ের নীরবে ক্ষরিত রক্ত
জমা হয় কালের নিক্তিতে।